আনন্দজ্যোতি গোপাল

—গুরুপ্রিয়া দেবী

আনন্দজ্যোতি গোপাল

—গুরুপ্রিয়া দেবী

প্রকাশিকা :

গুরুপ্রিয়া দেবী

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী আশ্রম

ভাদাইনী, বারাণসী।

প্রথম সংস্করণ

ডিসেম্বর, ১৯৭১

দ্বিতীয় সংস্করণ

এপ্রিল, ১৯৭২

মূল্য : পচাত্তর পয়সা

(গোপালের সেবার জন্য)

মুদ্রক :

কমলা প্রেস

গোধুলিয়া, বারাণসী।

ফোন : ৬৪২৭৩

প্রাক্‌কথন

মাকে এক সময়ে কেহ বলিয়াছিল—"মা, গোপালের সম্বন্ধে সব কথা তুমি একটু বল।" মা তখন বলিয়াছিলেন—"দেখি, কতটা আসে।"

ভগবানের রূপ অরূপ বিরাটেত, মায়ের খেয়ালে সাধনার খেলায় যখন—এই গোপালের কথা। তখন আর ঐ সম্বন্ধে বলা হয় নাই।

ঢাকায় বাজিতপুরে মায়ের সাধনার খেলা চলিতেছে—অনেক দিকের বিরাট তত্ত্বও। মা দেখিতেছেন মায়ের দক্ষিণ দিক দিয়া বিশাল এক স্থান—কত কিছু অবর্ণনীয়! বৃন্দাবনের বর্ণনা মা শুনিয়াছিলেন পরে ভগবতের কথায়। পূর্ব্বে ত আর ঐ সব কেহ মাকে শুনায় নাই। যতক্ষণ মা ঐ আসনে থাকিতেন সব সময় মায়ের ২।৩ হাতের মধ্যে—পাশেই গোপাল! কখনও বসিয়া—কখনও হামাগুড়ি দিয়া—কখনও একটু দাঁড়াইয়া, নড়িয়া চড়িয়াও! নিজের হাতপা লইয়া নিজেই খেলা করিতেন। কি এক সুন্দর ভঙ্গীতে গোপাল! সেই রূপের বর্ণনা কোন ভাষায় কতটা আর বলা যায়?—বুঝিয়া লওয়া। ঐ সব কথা গোপন রাখার ভাবই ছিল মার খেয়ালে।

গোপালের লীলাখেলার কথা মায়ের শ্রীমুখ হইতে যাহা কিছু শুনিবার সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছে এবং গোপাল নিজ হইতে কৃপা

করিয়া আমাদের আশ্রমে আসিবার পর হইতে যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষভাবে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি তাহাই সংক্ষিপ্তভাবে যথাযথ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস করিয়াছি। সময়াভাবে প্রকাশকের দিক দিয়া যথেষ্ট ভুল ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে সন্দেহ নাই। তাহার জন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। আশা রহিল মার কৃপা হইলে ভবিষ্যতে গোপালের অনবদ্য লীলা কাহিনী আরও বিস্তৃত আকারে প্রকাশিত করার সৌভাগ্য লাভ করিব।

কাশীধাম
২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

বিনীতা—
গুরুপ্রিয়া দেবী
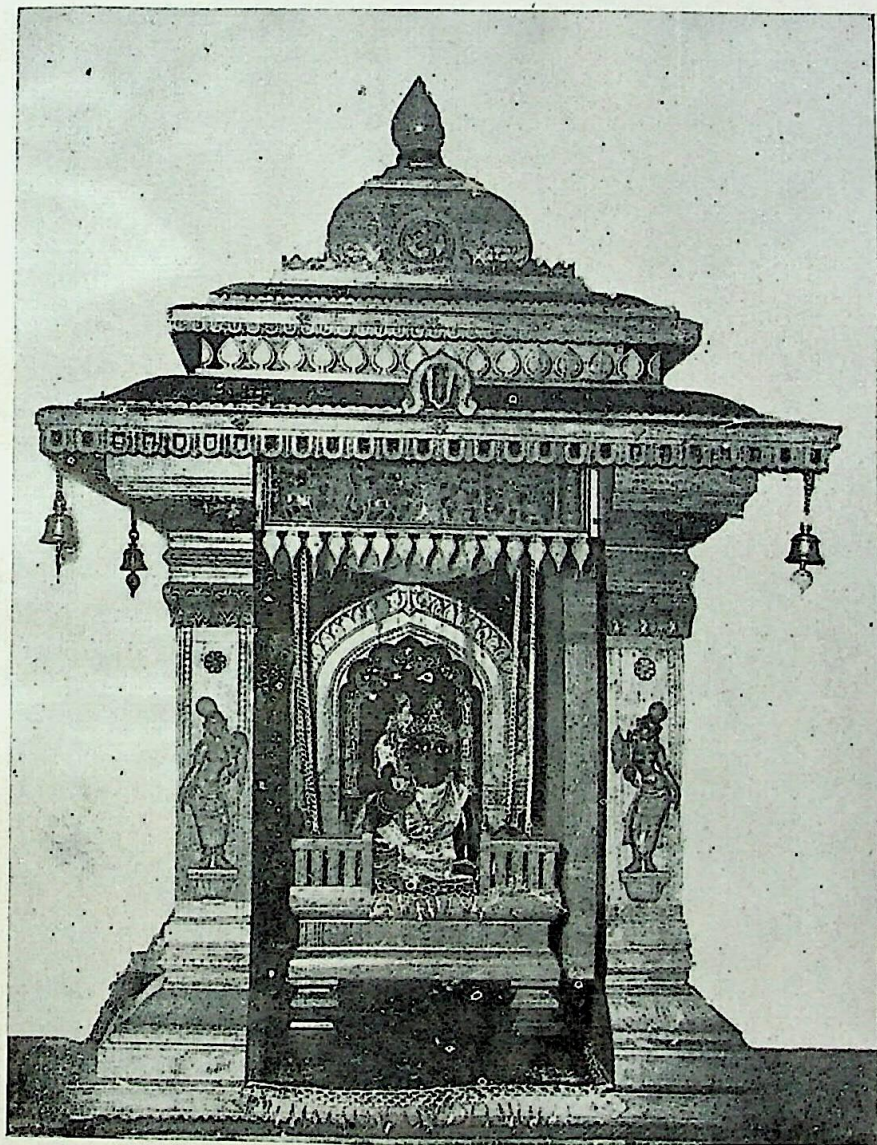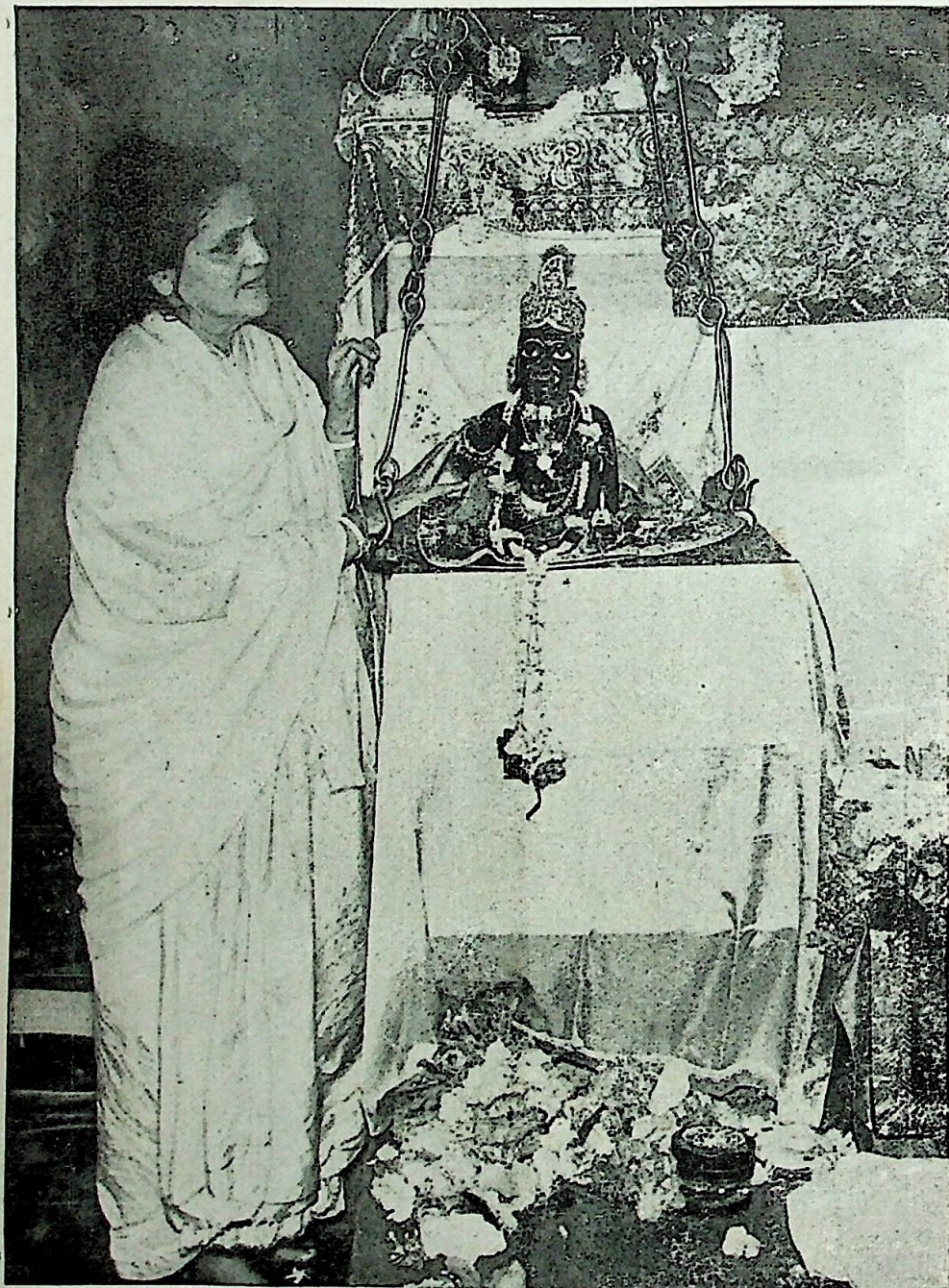
আনন্দজ্যোতি গোপাল

১৯৫২ সনের শেষ দিকের কথা। শ্রীশ্রীহরিবাবাজী মহারাজ মাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণ পরিভ্রমণে গিয়াছেন। সেই সুদূর দক্ষিণে কোনও এক স্থানে কলিকাতার এক ভক্ত ভদ্রমহিলার সঙ্গে মার দেখা হয়। তিনি আসিয়া মাকে বলিলেন—"এক গোপালকে আমি দেখিয়াছি আমার কোলে। খুব আদর করিতেছি। বেশ বড় গোপাল।" বাজিতপুরের সেই গোপালের কথা তখনই মার খেয়ালে আসিয়াছিল! সে বহু কথা। কিন্তু ঐ দিকটা গোপন রাখার ভাবই মার খেয়ালে।

ইহার বেশ কিছুদিন পরে মা কাশীতে আসিয়াছেন। বাটুদা* আসিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে গঙ্গাদিদির** গোপাল ত চুরি গিয়াছে, তিনি কোনও নূতন গোপাল লইবেন কি? মা গঙ্গাদিদিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলিলেন—"আমার ত যুগল ঠাকুর হইয়াছে।" তিনি অমত প্রকাশ করিলে বাটুদা তখন বলিলেন যে পাকিস্থানের কোনও জমিদারের একটি পুরাতন গোপাল মূর্ত্তি কাশীতে কাহারও বাড়ীতে আছে। তিনি সেবার উপযুক্ত অর্থের অভাবে গোপাল মূর্ত্তিটিকে গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিবার

---

* পণ্ডিত অগ্নিষ্বাত্ত শাস্ত্রী, মন্ত্রাচার্য্য। বাটুদা নামে পরিচিত।

** শ্রীমতী গঙ্গাদেবী, পঞ্চতীর্থ, বেদান্ত সরস্বতী। ইনি দীর্ঘদিন কাশী আশ্রমে কন্যাপীঠের প্রধানাচার্য্যা রূপে ছিলেন।

কথা ভাবিতেছিলেন। কেহ আগ্রহ প্রকাশ করিলে এখনই দিয়া দিবে।

এই সব কথা শুনিয়া মা একটু হাসিয়া পরমানন্দ স্বামিজী ও আমাকে বলিলেন—"কেহ গোপাল দিতে চাহিতেছে। তোমাদের আশ্রমে তোমরা গোপাল নিবে কি ? এই শরীর ঠাকুর আনিতে বলে কি করিয়া ? এখানে ত কোনও দস্তখত বা আঙ্গুলের টিপেরও প্রশ্ন নাই। তোমাদের মত হইলে বাটুকে তোমরা বলিতে পার। বাটুর সঙ্গে কথা বলিয়া ঠিক কর।" সব কথার পর গোপালকে আশ্রমে আনাই স্থির হইল।

এদিকে শ্রীশ্রীহরিবাবাজীর আহ্বানে মা বৃন্দাবন চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মা ব্রহ্মচারী কান্তিভাইকে বলিয়া গেলেন যে যদি আমরা যাওয়ার পর গোপালজীর বিগ্রহ আশ্রমে দিয়া যায় তবে যেন সঙ্গে করিয়া বৃন্দাবনে লইয়া যায়। মা বৃন্দাবনে পৌছিবার কয়েকদিন পরেই কাশী হইতে টেলিগ্রাম গেল যে কয়েকশত টাকা না পাইলে গোপাল বিগ্রহ দিতে রাজী নয়। এই কথা শুনিয়া পরমানন্দ স্বামিজী বলিলেন—"উহারা গোপাল দিতে চাহিয়াছিল তাই আনার কথা হইয়াছিল। পয়সা দিয়া নিতে হইলে ত কিনিয়াই স্থাপনা করিতে পারা যাইত।" এই সব কথার পর আর কোনও কথা নাই কিছুদিন।

আগষ্ট মাস, ১৯৫৪ সন। মা দেরাদুনে আছেন। কাশী হইতে কন্যাপীঠের মেয়েরা মাকে ঝুলন পূর্ণিমার উৎসবে থাকিবার জন্য বারবার প্রার্থনা জানাইয়াছে। কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।

মা নিজের ঘরে একদিন শুইয়া আছেন। হঠাৎ মার গোপালের কথা খেয়ালে আসিল। মা আপন ভাবে গোপালকে বলিলেন—"আসিবে ঠিক করিয়া আবার কি নট্খট্ বাধাইলে? কোনও ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া পড় না।"

৯ই আগষ্ট—আজ ঝুলন উৎসব আরম্ভ। মা বিকালে দেরাদুন হইতে আসিয়া পৌঁছিলেন। এমন সময় বাটুদা একখানা পত্র নিয়া আসিয়া উপস্থিত। শোনা গেল যাহাদের নিকট গোপাল মূর্ত্তি আছে তাহারা এখন বিনা অর্থেই দিতে প্রস্তুত। চিঠিখানা মাকে পড়িয়া শোনান হইল। সকল কথা শুনিয়া তখন গোপালকে আশ্রমে লইয়া আসাই ঠিক হইল। মা বলিলেন—"যে মোটরে এখনই আসিয়াছি সেই মোটরেই গোপালজীকে নিয়া আস।" কেহ বলিল—"এখনই দিবে কি?" মা—"না দেয় মোটর ফিরিয়া আসিবে।" কান্তিভাই ও বাটুদা রওনা হইয়া গেলেন।

সেইদিনই ঝুলন একাদশী তিথি। মার নির্দ্দেশে যজ্ঞভস্মের কুণ্ডের উপর গোপালজীর জন্য আসন ইত্যাদি সব পাতিয়া রাখা হইল। একটু পরেই বাটুদা গোপালজীকে লইয়া আসিয়া উপস্থিত। দেখিলাম বিগ্রহটি অতি সুন্দর। চক্ষু দুইটি জ্বল্জ্বল্ করিতেছে। দেখিতে প্রমাণ নবজাত শিশুর মত। ওজন প্রায় ১৮ সের। মাও আমাদের বলিলেন—"দেখ, দেখ, কি সুন্দর!" সন্ধ্যার পর আরতি ইত্যাদি করিয়া গোপালজীকে কন্যাপীঠের হলে ঝুলায় বসান হইল। কবিরাজ মহাশয়ও সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। দর্শন করিয়া তিনি বলিলেন—"এত একেবারে জাগ্রত বিগ্রহ।" মার উপস্থিতিতে এইভাবে ঝুলন উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল।

ইহার মধ্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বম্বে হইতে একজন গুজরাতী ভদ্রমহিলা মার নিকট আসিয়াছেন। তিনি পর পর রাত্রে দেখিতেছেন গোপাল বড় বড় চোখে তাকাইয়া আছেন হাত মেলিয়া চাওয়ার ভঙ্গীতে। গোপালের দৃষ্টি তাঁহার গলার হারের দিকে। ঠাকুর দেবতায় বিশেষ বিশ্বাস তাঁহার নাই। মায়ের সহিত দেখা হইবার পর মায়ের নিকট যাতায়াত করেন।

গোপালকে এইভাবে দেখিবার পর তিনি আর অন্য কোন দিকে মন দিতে পারিতেছেন না। রাত্রে ঘুমও নাই। দুইদিন ধরিয়া গোপাল মূর্ত্তি সর্ব্বদাই তাঁহার চোখের সামনে ভাসিতেছে। ভদ্রমহিলা মনে মনে স্থির করিলেন যে গোপালের পরিবর্ত্তে মা যদি তাঁহার কাছে কিছু চান তবেই তিনি কিছু দিবেন। আশ্চর্য্যের বিষয় সেইদিন রাত্রেই তিনি দেখেন যে গোপালের ন্যায় মা-ই তাঁহার দিকে হাত পাতিয়া আছেন।

পরদিন ভোরেই তাঁহার নিজের গলার হারটি খুলিয়া গঙ্গাজলে ধুইয়া আমার হাতে আনিয়া দিলেন। বলিলেন—"আমি ত গরীব, কি আর দিতে পারি? এইটি মাকে দিবেন গোপালের জন্য।" মা তাঁহাকে বলিলেন—"যাও নিজের হাতে গোপালের গলায় পরাইয়া দেও।" ইহার পর আর তিনি ঐরূপে গোপালকে দেখেন নাই। তবে ভগবানের প্রতি বাড়ীর সকলেরই জপ ধ্যানে মন লাগিল। পরিবারের দরিদ্রতাও আর ঐরূপ ছিল না।

গোপাল যেদিন আশ্রমে আসেন তখন আভরণ বা পোষাক বলিতে গেলে প্রায় কিছুই ছিল না। মাথায় রূপার ছোট একটু

ভাঙ্গা চূড়ার মত, পুরাতন মলিন শয্যা এবং একটি পুরাতন কাষ্ঠ সিংহাসন। কিন্তু আশ্রমে আসিবার পরেই কয়েকদিনের মধ্যে ধীরে ধীরে নানা আভরণ ও পোষাক সংগ্রহ হইয়া গেল।

পান্নালালজীও* ঐ সময়ে কাশীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মাকে বলিতেছিলেন—"মা, মনে হয় যেন গোপাল এখনই আসিয়া আপনার কোলে উঠিবে।" মাও হাসিয়া বলিলেন—"আমিও দেখছি, পিতাজী, গোপাল বারে বারে এই শরীরটার দিকেই দেখছে আর হাসছে।" আবার বলিতেছেন—"দেখ, গোপাল গঙ্গায় যাওয়ার বাহানা করিয়া এখানে আসিয়া হাজির হইলেন। এ কিন্তু সাধারণ না।"

জন্মাষ্টমীর দিনে কাশী আশ্রমের চণ্ডীমণ্ডপে সকাল বেলা গোপালজীকে নিয়া বসান হইয়াছে। মা স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বাটুদাকে দিয়াই অভিষেক, পূজা ও ভোগাদি সব করাইলেন। অভিষেক হইতেছে এমন সময় একটি ভদ্রমহিলা, চোখে ভাল দেখিতে পারেন না, খুব কাঁদিতেছেন। জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেন—"এই গোপালের আমি একটু সেবা করিতাম। চলিয়া আসিয়াছেন।" মা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—"যখন ইচ্ছা মা, তুমি আসিয়া গোপালের সেবা করিতে পার। তিনি সকলের উপর কৃপা করিয়া নিজেই আসিয়াছেন।"

বাটুদা সেখানেই ছিলেন। তাঁহার মুখে শোনা গেল যে তাঁহার ভাগিনেয় আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিল যে একদিন গোপাল স্বপ্নে

---

* ৺ডাঃ পান্নালাল, এম-এ, ডি-লিট্, সি-আই-ই, বার-এট-ল। ইনি একজন বিশেষ সম্মানিত রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। শ্রীশ্রীমার প্রতিও তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল।

আসিয়া তাহাকে বলেন—"চান্দু-চান্দু, আমার পূজা হয় না।" বাটুদা তাহাকে গিয়া ভাল মত পূজা করিতে বলেন। আবার কিছুদিন পরে নাকি গোপাল স্বপ্নে আসিয়া পুনরায় বলেন—"চান্দু-চান্দু, কাশী ছাড়িয়া যাইতে দিও না।" বাটুদার মুখে শুনিলাম কেহ বলিয়াছিল গঙ্গায় দিবে, না হয় কোনও কোণায় কাল কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিবে। প্রায় ২।৩ শত বৎসরের নাকি পুরাতন ঠাকুর কষ্টি পাথরের, কোনও এক জমিদার বাড়ীর শোনা যায়। পূজার খরচ ইত্যাদির শক্তি নাই। তাই ঠাকুরের সম্বন্ধে এই কথা।

মা এই সব শুনিয়া বলিয়াছিলেন—"দেখ, কেমন জাগ্রত গোপাল। এই সব কথা ত আগে জানা ছিল না। যখন কথা হইল যে কান্তিভাই গোপাল নিয়া বৃন্দাবন যাইবে তখন হঠাৎ টাকার একটা বাহানা করিয়া বৃন্দাবন যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। আর ঝুলনের সময় এই শরীরটার কাশীতে আসা হইয়াছে, ঠিক এখনই গোপালজী একেবারে ঠিক ঠিক দিনে আসিয়া হাজির হইলেন। এই সবই গোপালের খেলা।"

মধ্যরাত্রে মায়ের উপস্থিতিতে পঞ্চামৃতের দ্বারা গোপালের অভিষেক, পূজা এবং ভোগ ইত্যাদি সব ভালমত হইয়া গেল। পরে তিনি নিজ আসনে গিয়া বসিলেন।

গোপাল আজকাল বৎসরে দুইবার মাত্র সিংহাসন হইতে নীচে নামেন—জন্মাষ্টমী এবং দোল পূর্ণিমার দিনে। স্নান অভিষেক ও পূজার পর পুনরায় আসনে যাইয়া বসেন। আর প্রতি বৎসর ঝুলনের সময় তাঁহাকে ঝুলায় ঝোলান হয়।

১৯৫৭ সনের কথা। মার সেবার ঝুলনের সময় দেরাতুনে থাকার কথা। সেজন্য কাশী হইতে যাওয়ার পূর্ব্বে মা নারায়ণ স্বামীজী, অতুল, মামু প্রভৃতিকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেলেন খুব সাবধানে পাঁচজনে মিলিয়া ঝুলনের সব কিছু করা। যে সিংহাসনে গোপাল আশ্রমে আসিয়াছিলেন সেই সিংহাসনেই তখনও ছিলেন। পুরাতন হইয়াছিল। মা বলিলেন একটি চৌকিতে পাঁচজনে ধরিয়া সাবধানে নামান এবং ভাল একটি আসন বিছাইয়া গোপালকে রাখিয়া ঐ সিংহাসনের মধ্যে ঝুলা বানাইয়া গোপালকে ঝোলান। ঝুলনের পর আবার গোপালকে নামাইয়া চৌকিতে বসান। পরে ঐ সিংহাসনে আবার গোপালকে বসান। খুব সাবধানে সব করিবার কথা বলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

দেরাতুনে মা সংবাদ পাইলেন সব ঠিক মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কি অদ্ভুত, সেই ঝুলনের দিন হইতেই মায়ের শরীরে বেশ ব্যথা আর দেখেন গোপাল ডাগর ডাগর চোখে ইসারার ভঙ্গীতে জানাইতেছেন তাঁহার হাতে, পিঠে, শরীরে ব্যথা। দিনরাত্রি যেন আর দেখান বন্ধ হয় না। মা গোপালকে বলিলেন—"ভাল ভাবে হইয়াছে সকলে ত লিখিল। তোমার গায়ে চোট লাগিল কি করিয়া? আচ্ছা, চিঠি দিয়া খবর নিতেছি। কোথাও ধাক্কা লাগিল নাকি!"

চিঠির উত্তর আসিল কাশী হইতে—কোনওখানে ধাক্কা লাগে নাই। এদিকে গোপাল ত অনবরত মাকে একভাবেই দেখাইতেছেন। তখন মা বলিলেন—"আচ্ছা, গোপাল! কাশী গিয়া সব শুনিব।

পরে সব শুনিয়া যাহা করিতে হয় করা।" ব্যাস, আর ঐরূপ নাই।

দেরাদুন হইতে পরে মা যখন কাশীতে গেলেন সেখানে গিয়া সব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিলেন। সব শুনিয়া বলিলেন—"তোমরা সকলে বুঝিয়া লও। ঠাকুর একবার চৌকিতে, আবার ঝুলায়, আবার ঝুলা হইতে চৌকিতে, চৌকি হইতে নিজ আসনে—এইভাবে চারবার উঠান নামান হইয়াছে। তাই এত কষ্ট।" তখন সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—"যতদিন না ঠিক ভাল ব্যবস্থা হয় ততদিন ঝুলাতেই ঝোলান। ইহার পর হইতে ঝুলন পূর্ণিমার সময় ঐরূপই চলিতে লাগিল।

আর এক সময়ের কথা। কন্যাপীঠের সব মেয়েরা প্রাতে শিব-পূজা করিয়া গোপাল, অন্নপূর্ণা, শিব, নারায়ণ আদি দর্শন করিতে আসে। কালনদিদি* নিজে রোজ মেয়েদের নিয়া দর্শন প্রণামের জন্য আসিতেন। মেয়েরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলে তিনি নিজে প্রণাম করিতেন। একদিন তিনি গোপালকে প্রণাম করিয়া উঠিতে উঠিতে শুনিতে পাইলেন কাহারো স্বর—"রূপার মুকুট রোজ ভাল লাগে না।" চারদিকে তাকাইয়া কালনদিদি দেখেন কেহ কোথাও নাই। ভাবিলেন কেহ হয়ত কোথা হইতে বলিতেছে। পরের দিন তিনি আবার ঐ স্বর শুনিতে পাইলেন—"রূপার মুকুট সব সময় কি ভাল লাগে?" শোনা মাত্র তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখেন,

---

* শ্রীমতী ঊর্ম্মিলা দাস। ইনি শ্রীশ্রীমার বহু পুরাতন ভক্ত এবং কাশীতে শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী কন্যাপীঠের মেয়েদের দেখাশুনার ভার লইয়া দীর্ঘদিন আশ্রমে ছিলেন।

কই কোথাও কেহ নাই। মনে হইল গোপালই যেন বলিতেছেন। শব্দ আসিতেছে গোপালের নিকট হইতেই। যখন ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিলেন তখন তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইয়া চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কেমন এক ভাব। মনে মনে বলিলেন—"গোপাল, আমি ত গরীব। সোনার মুকুট তোমাকে কি করিয়া দিব ?"

কালনদিদির একটি ছেলে তখন ট্রেনিং নিতেছিল। সেই ছেলে যদি পাশ করে এবং চাকুরী পায় তাহার মাহিনা হইতে সোনার মুকুট বানাইয়া দিবেন মনে মনে এই সংকল্প করিয়া প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। ঐ কথা তাঁহার মনে মনেই রহিল। ভিতরে কেমন এক গম্ভীর ভাব।

কিছুদিনের মধ্যেই খবর আসিল যে ছেলে পাশ করিয়াছে এবং ৫০০৲ টাকার চাকুরী পাইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া তিনি গোপালকে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—"সোনার মুকুট বানাইয়া দিব।" মনে মনে স্থির করিলেন যে মা আসিলে মাকে বলিয়া মুকুট বানাইতে দিবেন। কিন্তু একটু যেন ঢিলা ভাব।

কয়েকদিন পরের কথা। হঠাৎ একদিন কালনদিদি দেখেন কন্যাপীঠে তাঁহার শয্যার ঢাকনির উপরে ও বালিশের উপর ধুলায় মাখা দুইটি ছোট্ট চরণ-চিহ্ন। তখন বৃষ্টি চলিতেছিল। অথচ চরণ-চিহ্ন ছিল শুকনা ধুলার। দেওয়ালে মাথার নিকটে ছিল একটি ক্যালেণ্ডার গোপালের ছবি সম্বলিত। তিনি ভাবিলেন যে কন্যাপীঠের বাচ্চা

মেয়েদের মধ্যে কেহ নিশ্চয়ই তাঁহার বালিশের উপর পা রাখিয়া ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখিয়াছে। তিনি রাগ করিয়া মেয়েদের সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহার ঐ পায়ের চিহ্ন? কিন্তু সকলেই একবাক্যে অস্বীকার করিতেছে। সাধারণতঃ তিনি ঘরে তালা বন্ধ করিয়া যান। ভাবিলেন আজ হয় ত ভুলিয়া গিয়াছি। আবার মনে পড়িল—আমি ত নিজেই তালা খুলিয়া ঘরে ঢুকিলাম। ক্ষমা* আসিয়া কালনদিদিকে বলিল—"দেখি আমি, কাহার পা, আমি বাহির করিব।" এই বলিয়া ক্ষমা সকল ছোট মেয়েদের পায়ের মাপ নিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য কোনও মেয়ের পায়ের মাপের সহিতই সেই চরণ চিহ্নের মিল নাই। তখন কালনদিদির মনে আপনা হইতেই ভাসিয়া উঠিল—তবে কি উহা গোপালজীরই চরণ যুগলের চিহ্ন? তখন চোখে তাঁহার জলের ধারা। সমগ্র বেড-কভারটি সযত্নে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন। মনে মনে বুঝিলেন ইহা সব গোপালেরই লীলা। বেড-কভারটি যত্ন করিয়া রাখিয়া দিলেন। মার নিকট সব খবর দিয়া চিঠি দিলেন। গোপালের সোনার মুকুটও কিছুদিনের মধ্যে বানান হইল। জন্মাষ্টমীর সময় মা আবার কাশীতে আসিলে মায়ের সম্মুখে ঐ সোনার মুকুট জন্মাষ্টমীর দিন গোপালকে পরান হইল।

গোপালজীর এই সব লীলা কথা শুনিয়া যোগীভাইও† পরে

---

* কুমারী সাবিত্রী মিত্র। আশ্রমে দীর্ঘদিন ব্রহ্মচারিণী রূপে থাকিয়া কন্যাপীঠের সেক্রেটারী হিসাবে সেবা করিয়াছে।

† সোলনের রাজা সাহেব শ্রীমান্ দুর্গা সিংহজী। মা তাঁহাকে নাম দিয়াছেন যোগীভাই।

সোনার একটি বড় মুকুট এবং সোনার কানের আভরণ বানাইয়া দিয়াছিলেন। টিহরীর রাজমাতাও পায়ের এবং কোমরের সোনার গহনা বানাইয়া দেন। এইভাবে শুনিয়া শুনিয়া কেহ কেহ যাহার যাহা ইচ্ছা করিয়া দিয়াছেন। দিল্লীর একজন শিখ ভক্ত বিশেষ আগ্রহ সহকারে মাকে একটি সোনার জরির ভাল কাজ করা মখমলের কালীন তাকিয়া এবং বেড-কভার দেন। জন্মাষ্টমীর দিন গোপালকে ঐ কালীনের উপর বসাইতে বলিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দের আগ্রহে উহার উপর মা স্বয়ং গোপালকে কোলে লইয়া বসেন। সেই উপলক্ষেই মায়ের কোলে গোপালসহ ছবি লওয়া হইয়াছিল। ভক্তদের মধ্যে কেহ ঐ ছবি দেখিয়া মাকে বলিয়াছিলেন—"মায়ের কোলে ত গোপাল দৃষ্টি ঘুরাইয়া নিয়াছে।" মা হাসিয়া বলিলেন—"এই শরীরটাকে গোপাল নিজের বসিবার আসন করিয়া নিয়াছে।"

ইতিপূর্ব্বেই মায়ের খেয়ালে গোপালের জন্য একটি চন্দন কাঠের সিংহাসনের অর্ডার দেওয়া হইয়াছিল মহীশূরে। প্রায় ১২০০০৲ ব্যয়ে এক অপূর্ব্ব সুন্দর চন্দন কাঠের সিংহাসন তৈয়ার হইয়া কাশীতে আসিয়া গেল। মায়ের নির্দ্দেশে সিংহাসন এমন ভাবে নির্ম্মিত যে ঝুলনের সময় গোপালকে আর নীচে নামাইতে হইবে না। তিনি স্থির থাকিবেন, অথচ ঝুলন হইবে। নূতন সেই সিংহাসনে উৎসব করিয়া মায়ের উপস্থিতিতে গোপালকে বসান হইল।

১৯৬৮ সনের ৩০শে এপ্রিল, অক্ষয় তৃতীয়ার শুভদিনে গোপালজী গিয়া স্থাপিত হইলেন কাশী আশ্রমের নবনির্ম্মিত "আনন্দজ্যোতি মন্দিরে।" ইহার একটু ইতিহাসও আছে। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার

ফলে কাশী আশ্রমের পাশেই একটি পুরাতন বড় বাড়ী কেনা সম্ভব হইয়াছিল। ঐ বাড়ীটিরও রেজেষ্ট্রী কলিকাতায় ১৯৫৪ সনের ঝুলন উৎসবের মধ্যে যখন গোপাল কৃপা করিয়া আমাদের আশ্রমে আসেন সেই সময়ই সম্পন্ন হয়। রেজেষ্ট্রী হইয়া গিয়াছে সংবাদ আসিয়াছে ইহা শুনিয়া মা বলিয়াছিলেন—"দেখ গোপাল আসিতে আসিতে তোমাদের বাড়ী হইল। এই বাড়ীটাকে গোপালের বাড়ী বলা হইবে।" আমি বলিয়াছিলাম—"মার মন্দিরের উদ্দেশ্যেই বাড়ী লইয়াছি। বেশ তোমার যাহা ইচ্ছা বল। গোপাল ত গঙ্গায় যাইতেছিলেন। মা তাঁহাকে নিজে কোলে তুলিয়া নিয়াছেন। ইহাই ত আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্মৃতি।"

পরবর্ত্তী কালে ঐ পুরাতন বাড়ী ভাঙ্গিয়া যখন সেই স্থানে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া এক অত্যুত্তম মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইল তখন সেই মন্দিরেই মায়ের খেয়ালে গোপাল গিয়া বিরাজমান হইলেন। মার কথায়—"গোপাল নিজেই মন্দির বানাইয়া বসিয়াছেন।" মা আরো বলেন—"যাহার যেমন ভাগ্য সে তেমন ভাবে গোপালকে পাইতেছে।" ১৯২৬ সনের ৪ঠা নভেম্বর ঢাকায় শাহবাগে কালীপুজার দিনে যে হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল সেই অগ্নিই এখন জ্যোতিরূপে মন্দির মধ্যে আছেন। শিবও আছেন সেই মন্দিরে।

গোপালজীর লীলা কাহিনীর অন্তর্গত অপর একটি ঘটনা। ১৯৭০ সনের কথা। মা কাশীতেই আছেন। একদিন সন্ধ্যার সময় এক

বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ মহিলা আসিয়া মন্দিরের সম্মুখে মায়ের হাতে তুইশত টাকা দিতে গেলে মা একটু সরিয়া গেলেন কারণ মাত নিজে টাকা ছোঁন না। সেই মহিলা তখন মার একটু কাছে ঘেসিয়া আসিয়া বলিলেন—"গোপালের ভোগ ও পূজার জন্য।" মার সঙ্গীয় কাহারো হাতে তিনি টাকা দিয়া দিলেন। মা তাঁহাকে পরদিন পূজার সময় আসিতে বলিলেন। মহিলাটি মাকে ধীরে ধীরে জানাইলেন—"আমি কাহারো বাড়ী রান্না করিয়া টাকা রোজগার করি। আমার খাওয়া পরা তাহা হইতেই চালাইতে হয়। আমার ত আসা কঠিন। এই টাকা আমি জমাইয়া নিয়া আসিয়াছি। গোপাল অনেক কিছু দেখাইয়াছেন।" মা তবু তাঁহাকে বলিলেন—"যখন তুমি রান্নার পর সময় পাইবে তখনই তুমি আসিও। খাইয়া কিন্তু আসিও না। এখানে প্রসাদ পাইবে। তোমার জানা সকলকেই নিয়া আসিও কিন্তু।" "আমার কেহ নাই। আমি একাই আসিব"—বলিয়া মহিলাটি তখন চলিয়া গেলেন।

পরদিন মার নির্দ্দেশে গোপালের সুন্দর ভাবে পূজা ভোগের ব্যবস্থা হইল। ফল এবং ফলহারী মিষ্টিও আসিল ভাল মতই। বৃদ্ধা মহিলার আসিতে অনেক দেরী হইলেও তাঁহাকে প্রসাদ দেওয়া হইল এবং তাঁহার বিশেষ আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে আরো প্রসাদ বাঁধিয়া দিয়া দেওয়া হইল। অবশিষ্ট প্রসাদ আশ্রমবাসী ও উপস্থিত অন্য সকলের মধ্যে বিতরণ করা হইল।

উপস্থিত অপর একজন স্ত্রীলোকের মুখে শোনা গেল যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণ মুখার্জ্জী পরিবারের। একবার খুব মরণাপন্ন রোগে অজ্ঞান

হইয়া আছেন এমন সময় গোপাল আসিয়া তাহাকে বলেন—"আমি আসিয়াছি। চক্ষু মেলিয়া দেখ।" বৃদ্ধা উত্তর দিলেন—"এত কষ্ট যে চক্ষু খুলিতে পারি না। মরিয়া যাইতেছি।" গোপাল আবার বলিলেন—"ঐ নৌকা তোমার জন্য, এখনও তটে আসে নাই। ঐ দেখ মধ্যগঙ্গায় যাতায়াত করিতেছে। চক্ষু মেল—খোল।" এই কথা শুনিতে শুনিতেই বৃদ্ধা স্পষ্ট অনুভব করিলেন যেন গোপালের চরণ তাঁহার চক্ষুর উপরে। গোপাল আবার বলিলেন—"চক্ষু খোল। আমাকে দেখ। আনন্দময়ী মায়ের আশ্রমে আমি থাকি। দেখ আনন্দময়ী মাকে।" তুই চক্ষু খুলিয়া বৃদ্ধা দেখেন মা ও গোপাল একই স্থানে। পরে আবার দেখিলেন গোপাল নাচিতেছেন নানা ভঙ্গীতে। জীবনে এই রকমটা আর তিনি দেখেন নাই। কত কত ছন্দে নাচ! আরও কত কি দেখিয়াছেন তাহা সেই স্ত্রীলোক আর বলিতে পারিল না। শুনিলাম এই সব দর্শনের পর হইতেই বৃদ্ধার অসুখ সারিয়া গেল।

কিছুদিন পূর্ব্বের আরো একটি ঘটনা। কলিকাতা হইতে মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে কেহ আসিয়াছে। মাও সেই সময়ই রওনা হইতেছেন হরিদ্বার অভিমুখে। ষ্টেশনে তাঁহাদের সঙ্গে দেখা। তাঁহারা আশ্রমে গিয়া উঠিলেন। কাশীতে ২।৩ দিন থাকার পর তাঁহারাও কনখলে আসিয়া মার সঙ্গে দেখা করিলেন। শুনিলাম তাঁহাদের মধ্যে একটি যুবক আশ্রমে গোপালজীর দর্শন করিতে বসিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান করিতেছিল। ঐ সময় গোপালজী তাঁহার নিকট আসিয়া বলেন—"আমাকে দেখ।" এই বলিয়া নানা ঢংগে নানা ভঙ্গীতে নাচিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন—"আবার আসিও।"

চক্ষু মেলিয়া, ঘড়িতে দেখিল প্রায় আধা ঘণ্টা হইয়া গিয়াছে। "এই প্রভাব জীবনে কখনো পাই নাই"—ছেলেটি স্পষ্ট ভাষায় মাকে বলিল। এইরূপ আরো আরো কত সব অনেকেই দেখেন।

গোপালের এই সব অমৃত-লীলার কথা গোপালের চরণেই সমর্পিত হইল।

পূর্ণজ্যোতি আনন্দজ্যোতি গোপালকে সর্ব্বাঙ্গ প্রণাম।